কাজী নজরুল ইসলামের গজল অঙ্গের গানে তালের ব্যবহার

স্বরূপ হোসেন*

সারসংক্ষেপ : কাজী নজরুল ইসলাম আধুনিক গানের ধারায় কাব্যের সংস্পর্শ ঘটিয়ে প্রথম শ্রোতার স্বাদ তৈরি করেছিলেন দৃশ্যময় কাব্যরসে। এরপর তিনি বাংলা গানের ধারায় যুক্ত করলেন পারস্য প্রেমের কবিতা যা 'গজল' নামে পরিচিত। গজলে তিনি মুক্ত সুরবিহারের মাধ্যমে পারস্য আর ভারতীয় সুরকে বাঁধার চেষ্টা করলেন একক বন্ধনীতে। সেই বন্ধনী হলো তাল আর ছন্দ। তাঁর গানে প্রচলিত তালের কাঠামোতেই সুর আর বাণীর ছন্দে তালের ছন্দ বিভাগ পেল নতুন মাত্রা; যা বর্তমান কালের শিল্পীর পরিবেশনাতেও নতুন নতুন রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এখানেই কাজী নজরুল ইসলামের গজলের কৃতিত্ব। গজল গানে প্রচলিত তালগুলোর ব্যবহারের নানা দিক উঠে এসেছে এই প্রবন্ধে।

প্রখ্যাত নজরুল গবেষক নারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'কাজী নজরুলের গান' গ্রন্থের ১০নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, "নজরুল সত্তায় যেন এক অফুরন্ত সৃষ্টির সঞ্চয় লুকানো ছিল। রূপকথার কল্পবৃক্ষে ঝাড়া দিলে যেমন তার থেকে সোনা রূপা ঝরে পড়ত, তেমনি কাজী নজরুল ইসলামের গানের গাছে নাড়া দিলে না চাইতেই গানের ফল টুপ করে পড়ত। সঙ্গীত জগতে কাজী নজরুল ছিলেন এমনি অদ্ভুত সৃষ্টিশীল প্রতিভা"। 'বিদ্রোহী' এবং 'কবি' নজরুলের আড়ালে কাজী নজরুল ইসলামের অন্যান্য পরিচয় প্রায়শই আড়াল হয়ে পড়ে। মাত্র ২২ বছরের কর্মজীবনে তিনি দুহাত ভরে সৃষ্টির আনন্দে মেতেছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি বেশকিছু ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন, নাটক রচনায় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন এবং পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে যেই বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছেন তা হলো তাঁর সংগীত। একাধারে তিনি গীতিকার, গীতিনাট্য রচয়িতা, সুরকার, সুরস্রষ্টা, সংগীত পরিচালক ও সংগীত শিক্ষক। তবে নজরুল প্রতিভার চূড়ান্ত স্ফুরণ ঘটেছে তাঁর গীতিকবিতায়। প্রথম জীবনে রাজনীতির

*লেকচারার, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.9

সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন বলেই হয়তো ১৯২০-১৯২৬ পর্যন্ত সময়কালে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মে দেশাত্মবোধক গানের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এর পরেই তিনি রচনা করেন গজল, ভক্তিসংগীত, নাটকের গান, চলচ্চিত্রের গান, খেয়াল, ধ্রুপদ, ঠুমরী, টপ্পা অঙ্গের গান, লোকসুরের গান প্রভৃতি। তবে তাঁর সংগীতে বিষয় আর বৈচিত্র্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে গজল। নজরুলের গানের এই ধারায় সুর ও তালে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের গজল অঙ্গের গানে তালের ব্যবহারের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গজল ফার্সি প্রেমের গান। পারস্যে এই গীতিধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। ভারতে মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর আরব-ইরানীয় সাংস্কৃতিক রীতির সাথে ভারতীয় ঐতিহ্য ধারার মিশেল অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই মিশ্রণেই গজল ভারতীয় সংগীত রীতিতে সংযুক্ত হয়। তবে এই সংযুক্তির ফলে গজলের রূপের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে। পারস্য প্রেমের গান ভারতীয় সংগীত রীতির সাথে মিলেমিশে কালিক বিবর্তনে রাগসংগীতানুগ হয়ে উঠেছে। ফলে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরির পরেই গজলের নাম আসে লঘুতর সংগীতরীতি হিসেবে।

গজল প্রেমের গান। ইরানে গজলের ঐতিহ্যধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ইরানি 'মিস্টিক' কবিরা। গজলের কাব্যরূপে কাব্যময়তার সাথে দর্শনের মিশেল এই মিস্টিক ধারাকে শক্তিশালী করে তোলে। মিস্টিক শব্দের সমার্থক বাংলা শব্দ হলো 'মরমী'। অর্থাৎ যেই কাব্যের প্রকাশিত অর্থের বাইরেও গূঢ় অর্থ মর্মে বা অন্তরে লুকায়িত থাকে তাই মরমী। মিস্টিক সাহিত্য ও সংগীতের ধারায় আপাত প্রকাশিত অর্থের অন্তরালে লুকানো থাকে মূল বা গূঢ় অর্থ। লেখক বা কবির মূল ঝোঁক থাকে এই গূঢ় অর্থ প্রকাশের দিকে। কিন্তু যেহেতু গূঢ় অর্থ অস্পষ্ট বা ধোঁয়াশায় আবৃত তাই মূল গানে বা রচনায় প্রচুর উপমা এবং রূপকের ব্যবহার গজল অঙ্গের গানের বৈশিষ্ট্য। গজলের রসভোক্তাদের আপাত অর্থে প্রাপ্ত ব্যখ্যা গ্রহণ করার সুযোগ যেমন থাকে তেমনি থাকে মূল অর্থের সন্ধানে যাবার সুযোগ।

গজলকে প্রেমের গান রূপে আখ্যা দেয়া হলেও গজল মোটেই নরনারীর প্রেমের গান নয়। লৌকিক প্রেম এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়, যাত্রা করে ঐশী প্রেমের দিকে। গজলের এই ধারার সাথে মিল পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলা গানের ধারার বৈষ্ণব পদাবলীর পুরুষ প্রকৃতি সম্পর্কের সাথে। (করুণময় ১৯৭৮ : ১৬৩) বৈষ্ণব পদাবলীতেও আপাত জগত আছে, তাতে প্রেম আছে কিন্তু সেই প্রেমের বিস্তার পরমপুরুষের সাথে প্রকৃতির বিচ্ছেদ যন্ত্রণার। প্রকৃতি তার আরাধ্য পরমপুরুষের সাথে মিলিত হতে চায় রূপকের আড়ালে। গজলেও লৌকিক জগতের প্রতিচ্ছবি আছে। ফুল, পাখি, সাকি, শরাব সবগুলো উপাদানই আমাদের পরিচিত জগতের

কিন্তু পরিচিত জগতের সকল উপাদান মিলে পরম জগতের সাথে মেলার আকাঙ্ক্ষায় গজলের রূপ পরিপূর্ণতা পায়।

গজলের দ্বিমুখীভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে দিলীপকুমার রায় বলেছেন, "গজল গান গাওয়া হত প্রথম পারস্যদেশে। বলা বাহুল্য ইরানীরা গজল গাইতেন পার্সি ভাষায়, এর বিষয় প্রণয়সংগীত। পারস্য সাহিত্যবিদরা বলেন ভাবের দিক দিয়ে গজলকে নাকি হতে হয় দ্ব্যর্থক অর্থাৎ সাধক যদি চান ওর মধ্যে পাবেন পারমার্থিক ব্যঞ্জনা, আবার প্রণয়ী যদি চান ওর মধ্যে পাবেন নরনারীর প্রেমব্যঞ্জনা"। (দিলীপ ১৯৩৮ : ৭৬)

ভারতে মুসলিম শাসন শুরুর পর গজলের বিকাশ ঘটে। (আবু সয়ীদ ১৯৭৬ : ১০৫) গজল পারস্যের রীতি বলে প্রচলিত হলেও মুসলমানদের ভারতে আগমনের মাধ্যমে এই রীতি ভারতীয় রূপ পায়। কিন্তু হিন্দুস্থানি সংগীত পদ্ধতিতে গায়নকলা একটু ভিন্ন। কারণ হিন্দুস্থানে প্রচলিত প্রবন্ধগীত, নাট্যগীত, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী সুর-প্রধান। গানের বাণীকে ছাপিয়ে সুরের বিস্তার আর কালোয়াতি সেখানে প্রধান। তাই কালের পরিক্রমায় গজল যখন হিন্দুস্থানি সংগীতের ধারায় গীত হতে শুরু করলো তখন থেকে এটি তার প্রাচীন পারস্য দেশীয় রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিন্দুস্থানি সংগীতের স্বভাবে অভ্যস্ত হতে শুরু করল। কিন্তু গজল কখনো সুর-প্রধান হতে পারে না। তাই ভারতীয় সংগীতে কাব্যগীতিরূপে গজলের প্রতিষ্ঠা হলো। শুরুর দিকে পারস্য গজলকে ভারতীয় সংগীতে রীতি-নীতির সাথে মেলাতে আদর্শগত কিছু বিভ্রাট দেখা দিল। তাই শুরুতে হিন্দুস্থানি গজলে না রক্ষা পেল ফার্সি মিস্টিক কাব্যাদর্শ, না স্বতন্ত্র থাকলো পারস্য সংগীতের রূপ। কিন্তু হিন্দুস্থানি সংগীতে গজলের প্রচলনে প্রচলিত ধারার সংগীতে কথা ও সুর প্রদানের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল। হিন্দুস্থানি গীত-রীতি আগে বাণী-মুখ্য ছিলো না, গজলের আবির্ভাবের পর রচয়িতারা বাণীর কাব্যিক উচ্চতা বজায় রাখার দিকে মনোযোগী হন। একই পরবর্তন ঘটে সুরকারদের ক্ষেত্রেও। ফলে হিন্দুস্থানি সংগীত রীতির প্রচলিত বক্তব্য প্রদানের রীতিতে প্রবল প্রভেদ দেখা যায়। ধীরে ধীরে সুরপ্রধান হিন্দুস্থানি রীতির সাথে বাণীপ্রধান পারস্য গীতরীতির সম্মিলনে ভারতে নতুন কাব্যভাবসমৃদ্ধ একটি স্বতন্ত্র গীত-রীতির প্রচলন হয়, তা হলো গজল।

দিলীপ কুমার রায় তাঁর 'সাঙ্গীতিকী" গ্রন্থের 'গজল' অধ্যায়ে লিখেছেন, "পারস্য গজল ভারতে এসে নিল এক নবরূপ। ইরানি সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের কিছু মিল আছে, কিন্তু খুব বেশি নয়। ভারতীয় সংগীতের ঐশ্বর্য বিচিত্র বিকশিত রাগসম্পদ তার নেই, কিন্তু তার আছে গভীর ব্যঞ্জনাময় কাব্যভাব। তাই ভারতে পার্সি গজল পেয়েছে নবজন্ম কিন্তু তা ভারতীয় সংগীতের ভূমিকায়"।

বাংলায় প্রথম গজল অঙ্গের গান রচনা করেন অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। আইনজীবী হিসেবে তিনি থাকতেন ঠুমরি ও গজলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র লখনৌতে। অতুলপ্রসাদ নিজে ঠুমরি গাইতেন এবং উর্দুতে ভালো দখল ছিল বলেই গজলের রস গ্রহণের সমস্ত পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল। বাংলায় গজল লেখার শুরুও সেই কারণেই। অতুলপ্রসাদ সেনের লেখা প্রথম গজল গান –

"কত গান তো হল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও?
যদি দেখা নাহি দিবে তবে মিছে কেন চাওয়াও?"

১৯৫০ সালে এইচএমভি রেকর্ড থেকে মঞ্জু গুপ্তের গাওয়া গানটির রেকর্ড প্রকাশিত হয়। রেকর্ডে তিনি বৈতালিক ভাবে গানটি গাইলেও আমরা অনুমান করি গানটি দাদরা তালে নিবদ্ধ। গানটি দাদরা তালে ৩/৩ ছন্দে বাঁধা আছে। এছাড়াও তিনি আরো কিছু গজল রচনা করেন। যেমন, "কে গো তুমি বিরহিণী", "রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা", "ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে", "জল বলে চল মোর সাথে চল" প্রভৃতি গান। এর মধ্যে "জল বলে চল" গানটি কাহারবা তালে ৪/৪ ছন্দে বাঁধা।

অতুলপ্রসাদ কিছু গজল গান রচনা করলেও বাংলা গানের ক্ষেত্রে 'গজল' নামে স্বতন্ত্র সৃষ্টির প্রাবল্য আনতে পারেননি। তাই তাঁর সৃষ্টিগুলো থেকে গেছে প্রথম প্রয়াস হিসেবেই, সেগুলো প্রস্ফুটিত হয়নি। এর মূল কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি শ্রোতা থেকে তাঁর ভৌগোলিক দূরত্বকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় কাজী নজরুল ইসলামই বাংলা গানে গজল যুগের প্রবর্তন করেন।

কাজী নজরুল ইসলামের গজল অঙ্গের গানে তালের ব্যবহার : কাজী নজরুল ইসলামের বিশাল সৃষ্টিভাণ্ডারে উজ্জ্বলতম রত্ন গজল গান। শুধু সুরেই তিনি বাংলা গানে পারস্য এই গীতিরীতিকে অবগাহন করিয়েছেন তা নয়, সুরের বৈচিত্র্যের খোঁজে মিলেছে প্রচলিত তাল আর ছন্দ-ভাঙা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কাজী নজরুল ইসলাম সুর আর ছন্দে গজল গানের পারস্যরীতির ছন্দোবদ্ধতা পরিবর্তন করেছিলেন ব্যাপকভাবে। গানের উদাহরণের মাধ্যমে তালের ঠেকার ব্যবহার পরিষ্কার হবে।

১। **বসিয়া বিজনে কেন একা মনে :** নজরুলের গজল অঙ্গের গানটি মূলত কাহারবা তালে নিবদ্ধ। কাহারবা তালের মূল ঠেকা –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধা	গে	না	তি	না	ক	ধি	না	ধা

তবে গানের ছন্দ অনুযায়ী এটি ১৯২৯ সালে কে মল্লিকের রেকর্ডে বাজানো হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধাতিট	ধিনধিন	না	ধিন	নাতিট	তিনতিন	নানা	তিট	ধা

যেহেতু আলোচ্য গানটি ধীরলয়ে বাঁধা তাই ছন্দের তাৎপর্য ঠিক রেখে উল্লেখ্য ঠেকাটি বাজানোর সময় ১ম এবং ৫ম মাত্রায় আধ মাত্রা পরে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে। গানটি ধীরলয়ের তাই গানের ছন্দপতন রোধে এবং মাত্রা সমান রাখতে অন্তরা সঞ্চারীর ছন্দের আদলে উল্লেখ্য ঠেকাটি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। গানের আভোগ শেষে স্থায়ীতে ফেরার সময় ঠেকার দ্বিগুণ লয়ে বাজে অথবা গায়ক বা তবলা বাদকের রুচি অনুযায়ী লগগি বা লড়ীর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধাতি	নাড়া	তাতি	নাড়া	ধাতি	নাড়া	তাতি	নাড়া	ধা

২। মুসাফির মোছরে আঁখি জল : কাজী নজরুল ইসলামের গজল অঙ্গে গানটি ১৯৩১ সালে কাশেম মল্লিকের কণ্ঠে রেকর্ডকৃত হয়। (ব্রহ্মমোহন ২০০৬ : ৬০১) গানটি কাহারবা তালে আবদ্ধ হলেও গানের ছন্দ অনুসারে ঠেকাটি মূল কাহারবা বাণীর না হয়ে খানিকটা সোজা বা খাড়া রূপ নিয়েছে। কাহারবা তাল আগে আলোচিত হওয়ায় সরাসরি আলোচ্য গানের ঠেকার রূপ দেখানো হল –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধাগ	ধিন	নাগ	ধিন	নাক	তিন	নানা	তিট	ধা

এখানে গানের মাত্রা অনুসারে মূল কাহারবার বাণীকে নতুন করে ছন্দোবদ্ধ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ গানে তিনটি অংশে একই সুরভঙ্গি অনুসরণ করায়, আলোচনার পুনরাবৃত্তি রোধে শুধু প্রথম অন্তরা নিয়ে আলোচনা করা হলো। গানের বাণীতে আছে –

"রে পাগল একি দুরাশা
জলে তুই বাঁধবি রে বাসা
মেটে না হেথায় পিয়াসা, হেথা নাই তৃষ্ণা দরিয়া"

গানের স্থায়ীর ঠেকা এই অংশে পরিবর্তিত হয়ে এ রূপ নেয় –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধিন	ধাধা	তিট	ধাধা	গেন	ধাধা	তিট	ধাধা	ধিন

এই ঠেকাটি পুনরায় স্থায়ী অংশে এসে স্থায়ী অংশে আলোচিত পূর্বের ঠেকার রূপটিকে অনুসরণ করে। এই গানটির আভোগ শেষে স্থায়ীতে ফেরার সময় ঠেকাটি দ্বিগুণে বাজিয়ে লাগগী বা লড়ী বাজানো হয়। যেমন –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধাতি ধাগে	তিন কিন	তাতি তাগে	ধিন গিন	ধাতি ধাগে	তিন কিন	তাতি তাগে	ধিন গিন	ধা

এবং শেষে গায়কের রুচি অনুসারে তেহাই বাজিয়ে শেষ করা হয়।

৩। **দাঁড়ালে দুয়ারে মোর :** গজল অঙ্গের এই গানটি ১৯৩৩ সালে কাজী নজরুল ইসলামের স্বকণ্ঠে রেকর্ড করা হয়। (ব্রহ্মমোহন ২০০৬ : ৩৬৮) গানটি দাদরা তালে নিবদ্ধ এবং পারস্যের গীতিরীতি অনুসরণ করে শেয়র অংশ তাল বিহীন গাওয়া হয়। মূল দাদরা তালের ঠেকাটি হলো –

১	২	৩	৪	৫	৬	১
+			০			+
ধা	ধি	না	ধা	তি	না	ধা

গানের ছন্দ অনুযায়ী ঠেকাটি ভিন্ন মাত্রা পায় এবং নতুন বোল বা বাণীর আবির্ভাব ঘটে। যেমন –

১	২	৩	৪	৫	৬	১
+			০			+
ধাতিট	ধিনধিন	না	ধাতিট	তিনতিন	না	ধা

গানের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য শেয়র শেষে স্থায়ী অংশে ফেরত আসার আগে তেহাই দিয়ে উল্লেখ্য ঠেকায় প্রবেশ করা হয়। গজল গানে সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্য হল গানে স্থায়ীতে ফেরার সময় প্রতিবার ছোটো ছোটো তেহাই দিয়ে সম বা প্রথম মাত্রায় ফেরত আসা হয়।

৪। **পাষাণের ভাঙালে ঘুম :** গজল অঙ্গের গানটি "বনগীতি" কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩২ সালে কাজী নজরুল ইসলাম নিজে সুরারোপ করে মেগাফোন কোম্পানির ব্যানারে ১৯৩২ সালে স্বকণ্ঠে ধারণকৃত রেকর্ডটি প্রকাশ করেন। (ব্রহ্মমোহন ২০০৬ : ৪৫২) গানটি তৃতীয় মাত্রা থেকে শুরু। ৩/৩ ছন্দে দাদরা তালে আবদ্ধ। দাদরা তালের মূল ঠেকা –

১	২	৩	৪	৫	৬	১
+			০			+
ধা	ধি	না	না	তি	না	ধা

আলোচ্য গানটিতে স্থায়ী অংশে ছন্দ অনুযায়ী ঠেকার ভিন্নরূপ চোখে পড়ে। যেমন –

১	২	৩	৪	৫	৬	১
+			০			+
ধাগে	তি	ট	নাগে	ধিন	ধিন	ধা

এবং অন্তরায় দাদরা তালের বাণী গানের বাণী ও সুরের ছন্দানুসারে পরিবর্তিত হয়। যেমন –

১	২	৩	৪	৫	৬	১
+			০			+
ধাতিট	ধিনধিন	না	ধা	তিন	না	ধা

'ওগো তোমার চরণ ছন্দে মোর' অংশটি গানের তালবিহীন শেয়র অংশ। শেয়রের শেষ লাইন 'মরিতে চায় সুরের বকুল' গেয়ে আভোগে তালে প্রবেশের আগে তেহাই দিয়ে উল্লেখ্য ঠেকায় প্রবেশ করা হয়। আভোগ শেষে ছোট তেহাই সহযোগে গানের স্থায়ীতে ফেরত আসা হয়।

৫। **বাগিচায় বুলবুলি তুই :** আলোচ্য গানটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রথম গজল গান। ১৯২৮ সালে কে. মল্লিক প্রথম গানটি রেকর্ড করেন। (ব্রহ্মমোহন

২০০৬ : ৫১৭) গানটি ৪/৪ ছন্দে কাহারবা তালে নিবদ্ধ। কাহারবা তালের মূল ঠেকা –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধা	গে	না	তি	না	ক	ধি	না	ধা

কিন্তু সুরের ছন্দানুসারে কাহারবা তালের ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। গানের স্থায়ী অংশে তালে প্রবেশের সময় ছোট ছোট রেলা দিয়ে প্রবেশ করা হয়। গানের স্থায়ী অংশে কাহারবা তাল মূল ঠেকা থেকে পরিবর্তিত হয়। যেমন –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধাক	ধিনধিন	নাক	ধিন	ধাগ	তিন	নানা	তিট	ধাক

গানের ৩টি অন্তরা অংশেই পুনরায় সুর ও বাণীর ছন্দানুসারে কাহারবা তালের বাণীর পরিবর্তন ঘটে। অন্তরায় ৪/৪ ছন্দের আড়ঠেকা[১] দেখতে পাওয়া যায়। তবলা বাদক তাঁর দক্ষতা অনুযায়ী ঠেকা ঠিক রেখে বোল বা বাণীকে আড়ছন্দে সংগীত শিল্পীর গায়নের সাথে প্রয়োগ করেন –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধাত্র	ঝকধিন	নাতি	ঝনতিন	তাত্র	ঝকধিন	নাধি	ঝনতিন	ধা

৬। **নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল :** কাজী নজরুল ইসলামের গজল অঙ্গের এই গানটি আঙ্গুরবালার কণ্ঠে ১৯২৯ সালে প্রথম রেকর্ড হয়। (ব্রহ্মমোহন ২০০৬ : ৬৪০৫) গানটি কাহারবা তালে ৪/৪ ছন্দে নিবদ্ধ। গানটি চঞ্চল গতির হওয়ায় মূল কাহারবার ঠেকা পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপ পরিগ্রহ করে –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধা	তাক	তি	ট	তাক	তিট	ধিন	ধিন	ধা

তিনটি অন্তরার শুরুর অংশে ঠেকা একই থাকলেও, অন্তরার দ্বিতীয় লাইনে এসে পরিবর্তিত হচ্ছে ছন্দানুসারে। যেমন –

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
+				০				+
ধাতি	টধি	নাধি	নধিন	তাতি	টতি	নাধি	নধিন	ধা

আভোগ শেষে ছোটো তেহাই সহযোগে গানের স্থায়ীতে ফেরত আসা হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের গজল অঙ্গের গানগুলোতে ছন্দের প্রভাব এবং ঠেকার চলন একটু ভিন্ন এবং চটুল ধারার থাকায় সেখানে প্রত্যেকটি অংশ সম্পূর্ণ করে পুনরায় স্থায়ীতে প্রবেশের সময় কিছু ঠেকার অলংকার প্রয়োগ করে পুনরায় মূল ঠেকায় ফিরে আসে। ইন্টারল্যুড এবং প্রিল্যুড বাজানোর সময় বা গান সম্পূর্ণ করার পর স্থায়ী অংশ শেষ করার আগ মুহূর্তে কিছু লগগী বা লড়ী প্রয়োগ করা হয়। এতে গানের পরিবেশন এবং শ্রবণে মানের গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

কাজী নজরুল ইসলাম আধুনিক গানের ধারায় কাব্যের সংস্পর্শ ঘটিয়ে প্রথম শ্রোতার স্বাদ তৈরি করেছিলেন দৃশ্যময় কাব্যরসে। এরপরে বাংলা গানের ধারায় যুক্ত করলেন পারস্য প্রেমের কবিতা যা 'গজল' নামে পরিচিত। গজলে তিনি মুক্ত সুরবিহারের মাধ্যমে পারস্য আর ভারতীয় সুরকে বাঁধার চেষ্টা করলেন একক বন্ধনীতে। এই ক্ষেত্রে বন্ধনীর কাজ করেছিল তাল বা ছন্দ। প্রচলিত তালের কাঠামো না ভেঙে শিল্পীর গায়কী এবং বাণী ও সুরের ধাঁচে শুধু ছন্দের নিত্য নতুন ভাঙন পেল রস আস্বাদনকারী শ্রোতা। এখানে সুর, বাণী আর তালের মিশ্রণে কাজী নজরুল ইসলামের গজল অনন্য।

টীকা

১. আড় ঠেকা : দেড়গুণ গতির ছন্দ অর্থাৎ নির্দিষ্ট দুইমাত্রা সময়ের মধ্যে তিনটি মাত্রা একত্র করে এক মাত্রার স্থায়ীত্বকালের মধ্যে দেড় মাত্রার প্রয়োগ হলে তাকে আড় লয় বা আড় ঠেকা বলে। (ড. শম্ভুনাথ ঘোষ, *তবলার ইতিবৃত্ত*, মীরানাথ সঙ্গীত প্রকাশন, কলকাতা, ১৫ অগাস্ট, ১৯৭২, পৃ. ৮৫)

গ্রন্থপঞ্জি

করুণাময় গোস্বামী (১৯৭৮)। *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

দিলীপ কুমার রায় (১৯৩৮)। *সাঙ্গীতিকী*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯৭৬)। *গালিবের গজল থেকে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (মে ২০০৯)। *নজরুল সংগীত নির্দেশিকা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা